

মাটি ও মাটির কাজ

[আন্তঃপ্রাদেশিক ও নিখিল ভারতীয় জনপ্রিয় সাহিত্য প্রতিযোগিতায়
ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত]

মাটি ও মাটির কাজ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী
(ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত)

অ শো ক পু স্ত কা ল য়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৬৩

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র

৬৪ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীস্বপন কুমার বারিক কর্তৃক প্রকাশিত ও
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত এবং ৬৫।৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, নিউ মহামায়া প্রেস হইতে
শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না কর্তৃক মুদ্রিত

No. F. 19-88/56-8.2.

Government of India

Ministry of Education.

New Delhi-2, Dated 29th October, 1956.

From Shri Kul Bhusan
Special Officer (Literature)

To Shri Nani Gopal Chakravarti
C/o. Ashoke Pustakalaya
64, Harrison Road,
Calcutta.
(*West Bengal*).

Sub. :—*Encouragement of Popular Literature.*

Sir,

I am directed to inform you that your book entitled **Mati-o-Matir Kaj** in Bengali has won a prize of Rs. 500/- (Five hundred only). Steps are being taken to make this payment to you.

* * * * * * *

Yours faithfully
Sd/- Kul Bhusan.
Special Officer (Literature)

'কুম্ভকার, সূত্রধর, কামার, চামার,
মাঝি-মাল্লা, তাঁতি-জোলা, সবাই আমার
নমস্য—সবাই মোরে কিছু করে দান,
সুখ দেয়, দুখ হ'তে করে পরিত্রাণ।
সবারে চিনিনা, তবু দানের বন্ধনে
বাঁধা আছি নানাদিকে সকলের সনে।'

—কামিনী রায়

ভূমিকা

মাটির কাজ পৃথিবীকে শস্যশালিনী ক'রে তুলে মানুষের বেঁচে থাকার উপায় দেখিয়ে দেওয়া আর গাছপালা ও জীবজন্তুকে পৃথিবীর বুকে স্থান দেওয়া।

কিন্তু মাটির সে সব কাজের কথা এখানে বলা হচ্ছে না—এখানে শস্য-উৎপাদন ছাড়াও মাটির সাহায্যে আমরা কি কি কাজ ক'রে থাকি তারই সংক্ষিপ্ত ও সরল বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে।

বি. পি. টেকনিক্যাল স্কুল,
কৃষ্ণনগর ; নদীয়া।

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

এই লেখকেরই লেখা—

*	বাঁশ, বেত, পাতা ও শোলার কাজ—	১৲
*	মাটি ও মাটির কাজ—	১।০
* *	কাঠ ও কাঠের কাজ—	১॥০
* *	তন্তু-শিল্পের কাজ—	১৲
	যে সব শিল্প এদেশে ছিল না—	১।০
	সিট মেটাল বা ধাতুর কাজ—	১।০
	বাড়ীতে যা করতে পারো—	১।০

* ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

* * ভারত সরকার ও পশ্চিম-বঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

প্রথম অধ্যায়

মাটির উপাদান

পাথরের গুঁড়ো রূপান্তরিত হ'য়ে মাটি তৈরী হয়। জীব-জন্তুর মৃতদেহ, গাছপালার গলিত অংশও মাটিতে রূপান্তরিত হয়। বড় বড় গাছের শিকড় কখনও কখনও কঠিন শিলাকে চূর্ণ করে। আর ঐ কঠিন শিলা ক্রমে মাটিতে পরিণত হয়। কেঁচো প্রভৃতি কীটও মাটি তৈরী করে।

মাটির শ্রেণী বিভাগ

সাধারণতঃ মাটিকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করে থাকি—এঁটেল মাটি, দোআঁশ মাটি ও বেলে মাটি। তা ছাড়া ধস মাটি এবং কাদা মাটিও আছে। সব জায়গার মাটিও সমান নয়। বালি ও কাদার পরিমাণ অনুসারে মাটির তারতম্য হয়।

এঁটেল মাটি : এই মাটির কণাগুলি খুব সুক্ষ্ম, জল দিয়ে পিষলে আঠার মত মনে হয়। এতে কাদার ভাগই বেশী থাকে। এই মাটি শুকুলে খুব শক্ত হয়; সেইজন্য কেবলমাত্র এই মাটি দিয়েই কোনও কাজ করা চলে না, কারণ মাটি শুকিয়ে যাওয়ার সময় জিনিষটি ফেটে যাবার ভয় থাকে।

দোআঁশ মাটি : প্রায় অর্ধেক অংশই এর কাদা। অপর অর্ধেকের অধিকাংশ জৈব পদার্থ এবং খুব কম বালির অংশ থাকে।

বেলে মাটি : বালির অংশই এতে বেশি। এর কণাগুলি এঁটেল মাটির প্রকৃতির বিপরীত। এর কণাগুলি সুক্ষ্ম নয় এবং এই মাটিতে জলও দাঁড়ায় না।

ধস মাটি ঃ এতে শতকরা ১০-৩০ ভাগ কাদা, ১-১০ ভাগ চূণ জাতীয় ও জৈব পদার্থ আর অবশিষ্টাংশ বালি। এই মাটি খুব আঁট বা খুব আল্‌গা নয়। নদীর 'পলি মাটিকে' ধস মাটি বলা যেতে পারে।

কাদা মাটি ঃ এর ৭০-৮০ ভাগই কাদা এবং অবশিষ্ট বালি।

আদিম কালের যাযাবর মানুষকে ঘর বেঁধে বাস করতে বাধ্য করেছে—মাটি। যেদিন থেকে মানুষ শস্য-উৎপাদন করতে শিখল, সেই দিন থেকেই হ'ল তার সভ্যতার পথে পদক্ষেপ।

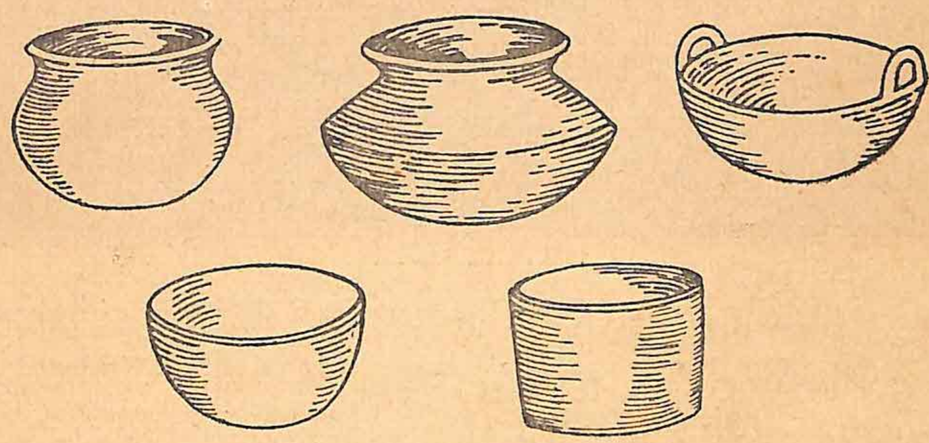
কিন্তু শস্য-উৎপাদন ছাড়াও মানুষ মাটি দিয়ে তার কত কি জিনিষ তৈরী করেছে। প্রাচীনযুগের ইতিহাস থেকে জানা যায় নরম-মাটির থালায় ব্যাবিলনের মানুষরা তাদের কথা ও কাহিনী লিখে রেখেছিল। এখানে সুমেরীয় ভাষায় লেখা প্রায় ত্রিশ হাজার মাটির 'খাপরা' বা পাতলা টালি পাওয়া গেছে। পণ্ডিতেরা বলেন সেটা নাকি একটা গোটা লাইব্রেরী।

ধাতু-পাত্র আবিষ্কারের পর মানুষ মাটির থালায় ভাত খায়নি নিশ্চয়ই; কিন্তু অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক দেশেই মানুষ মাটির পুতুল তৈরী করে আসছে একথা অস্বীকার করা যায় না।

কেবল মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পাই নয়—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাটির নীচে থেকে অনেক মাটির পাত্র পাওয়া গেছে। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি, বহু শত বৎসর আগে থেকেই মাটির তৈরী তৈজসপত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এইবার মাটি দিয়ে কি কি তৈরী হ'য়ে থাকে তাই আমরা আলোচনা করব।

মাটি দিয়ে যা কিছু তৈরি হ'ক না কেন, আগে মাটিকে জল দিয়ে বেশ ক'রে চট্‌কে নিতে হবে। বিভিন্ন ধরণের কাজের জন্য বিভিন্ন রকম মাটি ব্যবহৃত হয়। দোআঁশ মাটি ইট ও হাঁড়িকুঁড়ির জন্য, এঁটেল মাটি পুতুল ও মূর্তি তৈরির জন্য এবং এঁটেল ও বালি



মাটির তৈরি তৈজসপত্র

মাটি জলের কলসী, কুঁজো প্রভৃতি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় কাজের সুবিধার জন্য মাটির সঙ্গে খড় বা পাট মিশিয়েও নেওয়া হয়।

কুমোরেরা পা দিয়ে মাটিকে বেশ করে চট্‌কে নেয়। উপরে একটা দড়ি বেঁধে সেই দড়িটাকে হাত দিয়ে ধরে মাটি চট্‌কানো সুবিধা হয়। ইট তৈরির মাটি প্রচুর জল দিয়ে চট্‌কিয়ে নেওয়া দরকার। এইজন্য কখনও কখনও গরু কিম্বা মোষ দিয়েও মাটি চট্‌কানো হয়।

পুতুল, বাষ্ট্, মাটির ফল প্রভৃতি তৈরির জন্য যে মাটি চট্‌কানো হয় সেটাকে ভিজে চট বা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখাই উচিৎ। তা না হলে মাটিটা শক্ত হয়ে যেতে পারে।

গুহাবাসী মানুষ যখন তার গুহা ছেড়ে ঘর বেঁধে বাস করতে লাগল তখন মাটির সাহায্য সে নিয়েছিল। পোস্তা গাঁথতে, বেড়ায় প্রলেপ দিতে মাটির দরকার হয়।



গৃহস্থালীর কাজে মাটির জিনিষ

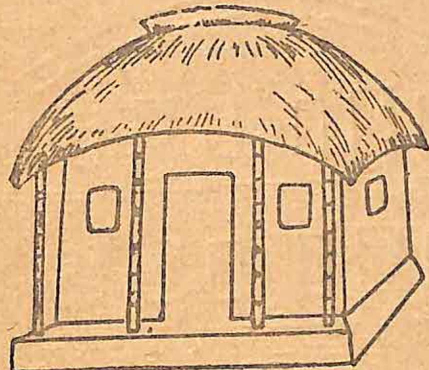
গৃহস্থালীর কাজেও মাটির জিনিষ সেই আদিম যুগ থেকে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে। হাঁড়ি, সরা, মালসা, লক্ষ্মীর সরা, পিঠে তৈরির সরা-মুচি (ঢাকনী), মুড়ি ভাজবার জন্য টানা-খোলা, ঝাঁজরী—একা একা ধান ভানবার জন্য 'নোটের' উপর দেওয়ার 'গড়' সবই মাটি দিয়ে তৈরি হয়।

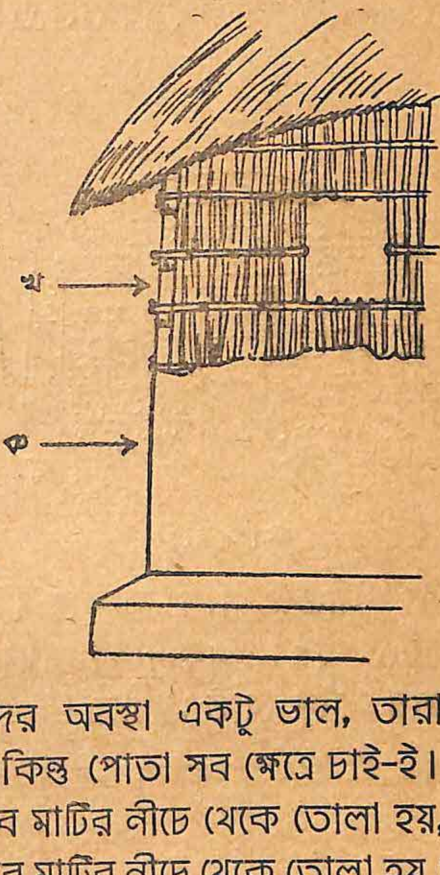


বাঁশের খুঁটি

এই সব যখন তৈরী হ'চ্ছিল তখন থেকেই যে মাটির পুতুল এবং মাটির থাপরায় বই লেখা আরম্ভ হ'য়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তামা বা পিতল-কাঁসার ঘটি, বাটি, গ্লাস প্রভৃতি তৈরি হওয়ার আগে মাটির গ্লাস, মাটির বাটি এবং হাঁড়ি তৈরি করতে মানুষ শিখেছিল ; কারণ, মাটির বিভিন্ন আকারের পাত্রের সাহায্যেই তৈরি হয় ধাতুপাত্র।

পল্লীগ্রামে ঘরের কাজ সাধারণত দু'রকমের করা হয়—খুঁটির ঘর এবং মাটির দেওয়ালের ঘর। যারা খুব গরীব, তারা বাঁশের খুঁটির ওপর চালাঘর তোলে আর কঞ্চি দিয়ে বেড়া দেয়। এই কঞ্চির বা বাঁশের ফালির বেড়ার গায়ে সুন্দর করে মাটির



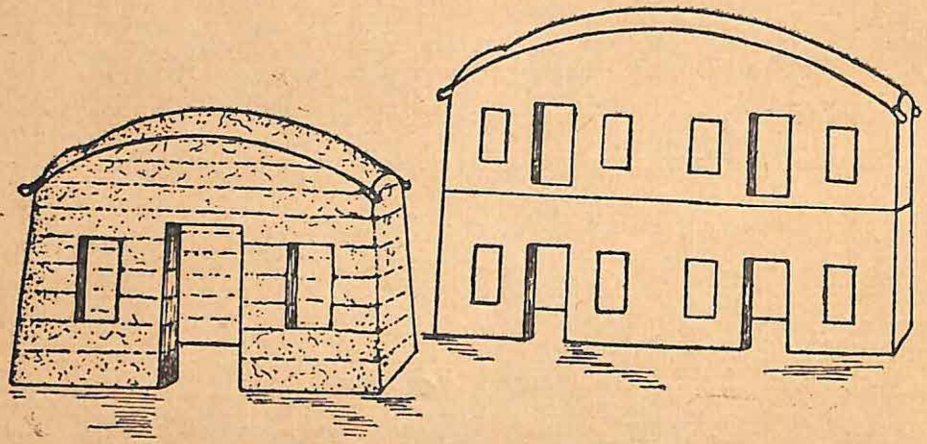


ক—মাটির প্রলেপ দেওয়ার পর অবস্থা
খ—কঞ্চি দিয়ে বাঁধা—এখনও মাটির প্রলেপ দেওয়া হয় নাই

প্রলেপ দিয়ে নেওয়া হয়। যাদের অবস্থা একটু ভাল, তারা বেড়ার বদলে মাটির দেওয়াল দেয়, কিন্তু পোতা সব ক্ষেত্রে চাই-ই।

পাকা বাড়ীর 'ভিত্' যে ভাবে মাটির নীচে থেকে তোলা হয়, কাঁচা ঘরের 'পোতা' ও ঠিক সে ভাবে মাটির নীচে থেকে তোলা হয়। খুঁটির ঘরের খুঁটিগুলি আগে পুঁতে নিয়ে তারপর মাটি ঢালতে হয়। চারপাশে জল দিয়ে মাটি চট্‌কে নিয়ে ভিত্ বা পোতা করতে হয়।

দেওয়াল তুলতে হলে এই ভিতের পর থেকে হাত খানেক উঁচু করে চারিদিকে দেওয়াল তুলতে হয়। এই অংশটা একটু শুকালে তারপর আবার এক হাত উঁচু করে এবং কুড়ি-পঁচিশ ইঞ্চি পুরু করে গাঁথতে হবে। এইভাবে যতটা উঁচু করতে হবে দেওয়াল ততখানি গেঁথে তুলতে হবে।



মাটির বাড়ী পাকা বাড়ী

নীচের অংশ শুকিয়ে নিয়ে ক্রমে ক্রমে পরের দেয়াল তৈরি করতে হয়। একদিনেই সবখানি দেওয়াল গাঁথতে গেলে হুড়মুড় করে প'ড়ে যেতেও পারে। তৈরির সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, গোড়া থেকে উপরের দিকটা বেশী ভারী না হয় এবং দেওয়ালের 'ঝোঁক' যেন বাইরের দিকে থাকে। দেওয়ালটিকে শক্ত করবার জন্য মাটির মধ্যে খড় বা পাট কেটে এবং তুঁষ মিশিয়েও নেওয়া হয়। পশ্চিম বাংলার বহু অঞ্চলে দোতালা মাটির ঘরও দেখা যায়।



পাটা

পোতা গাঁথতে, বেড়ায় মাটির প্রলেপ দিতে বা দেওয়াল তুলতে বাঁশের ছাল বা মোটা চোঁচ্ আঁচড়া হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তারপর ন্যাকড়া (বা পাট) দিয়ে লেপতে হয়। দেওয়ালের উপরিভাগ সমতল করতে হলে পাটার দরকার হয়।

এর পর 'গড়ে'র কথা বলা যেতে পারে। গড় ধান ভানতে ব্যবহারে লাগে। এটা একটা মাটির পুরু বেড় বিশেষ। এঁটেল মাটি বেশ করে চট্‌কে নিয়ে তার মধ্যে শন, পাট ও তুঁষ দিয়ে পুরু ক'রে একটা বেড় তৈরি ক'রে নেওয়া হয়। পরে সেটাকে রোদ্রে শুকিয়ে বেশ ক'রে লেপে নিতে হবে। ধান ভানতে 'নোটের' ওপর ওটা রেখে নিলে ধান ছিট্‌কে বাইরে যায় না।

মাটির পুতুল তৈরি করতে চাই—এঁটেল মাটি, কিছু পরিষ্কার ন্যাকড়া, খুব পাতলা একটা ছুরি (বা বাঁশের ওপরের নীল অংশটার খানিকটা) এবং কিছু জল।

এঁটেল মাটি নদীর পাড়ে পাওয়া যাবে। নদীর ভাঙন কূলে —যেখানে স্তরে স্তরে মাটি দেখা যায়—সেখানে সাদা রঙের মাটিটা হচ্ছে বেলে মাটি। কালচে রঙয়ের মাটিটাকে জল দিয়ে চট্‌কালে আঠার মত এঁটে ধরে। এই মাটি দিয়ে পুতুল গড়া হয়। দেখতে হবে, মাটিতে যেন কাঁকর না থাকে। তারপর মাটিটাকে জল দিয়ে বেশ করে চট্‌কে নিয়ে ইচ্ছামত পুতুল গড়া চলবে। বাঁশের পাতলা এবং ধারালো কাঠি আঁচড়া হিসাবে ব্যবহৃত হবে। ন্যাকড়া জলে ভিজিয়ে পুতুলের দেহটা পরিষ্কার করে লেপে নিতে হবে।


মাটির ছাঁচে তৈরি পুতুল

তৈরি-মাটি হাতে নিয়ে বসলে শিল্পীর কত কি তৈরি করবার কথা মনে উদয় হবে।

কাছিম ঃ ময়দার যেমন ‘লেচি’ করে তেমনি দুটো লেচি করে নাও। দু’হাতের তালুর চাপে ঐ লেচি দু’টিকে চ্যাপটা করে নাও। তারপর গোল ও লম্বা আকারের চারটে পা ও অপেক্ষাকৃত মোটা একটা শুঁড় বানাও। শুঁড়ের মাথায় মটর কলাইয়ের মতন দুটো চোখ থাকবে। আঙুল টিপে চোখ দুটো একটু চ্যাপ্‌টা করে নিতে হবে।

চ্যাপ্টা লেচি দুটির একটিকে নীচে রেখে ওর উপর যথা স্থানে চারটে হাত ও একটা শুঁড় বসাও। তারপর অপর চ্যাপ্টা লেচিটা ওর উপর চাপিয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে পাশগুলো টিপে লেচি দুটির মুখ জোড়া দিয়ে নাও।

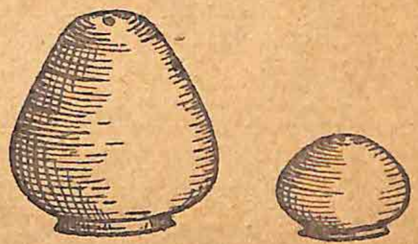
এইবার একটু আঙুলের কসরৎ লাগবে। পা-চারটির শেষ প্রান্ত একটু চ্যাপ্টা করে দিতে হবে। শুঁড়ের মুখটাও হবে সরু।

শুঁড় এবং পাগুলি নড়ছে এমন যদি করতে চাও তা হলে আর একটু কৌশল করতে হবে। খুব পাতলা ফিতে (বা কোন গাছের পাতলা সরু ছাল) ঐ শুঁড় ও পাগুলির গোড়ায় এঁটে নিয়ে (কাঁচা অবস্থায়) কাছিমের দেহের মধ্যে ঐ ফিতের অপর প্রান্ত এঁটে নিতে হবে। তারপর পুতুলটি শুকিয়ে পরে রঙ চঙ করেও নেওয়া যেতে পারে।

খেলনা শিল-নোড়া বা জাঁতা ঃ এগুলি তৈরি করাও কঠিন নয়। মাটির লেচি তৈরি করে পরে ওগুলি চ্যাপ্টা ও গোল করতে হবে। তারপর রোদ্রে শুকিয়ে রঙ করে নেওয়া কঠিন হবে না।

দোয়াত ও তুবড়ীর খোল : আগেকার দিনে ছেলেরা যখন গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়তো তখন তারা মাটির দোয়াত, থাক্ বা কঞ্চির কলম এবং তালপাতা বা কলাপাতা ব্যবহার করত। খানিকটা মাটির তাল নিয়ে হাত দিয়ে সেটা থেকে দোয়াত তৈরি করা খুব কঠিন নয়। আঙুল দিয়ে ভিতরটা ফাঁপা করে নিতে হয়। মুখটা যাতে সরু থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। দোয়াতের গায়ে (বাইরের দিকে) তিন জায়গায় উঁচুমত করে ছিদ্র করে নেবে। ঐছিদ্রে দড়ি ঢুকিয়ে তিনটি দড়ির মুখ এক সঙ্গে বাঁধবে। এইখানটা হবে দোয়াতটি ঝুলিয়ে নেবার জায়গা। দোয়াতটি শুকোলে তারপর আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া দরকার। মাটির প্রদীপও এইভাবে দু'হাতের আঙুলের সাহায্যে সহজে তৈরি করা যেতে পারে।

দোয়াতের মত তুবড়ীর খোলও ঐ নিয়মে করতে হয়। এরও ভিতরটা সম্পূর্ণ ফাঁপা রাখতে হবে। এর নীচের মুখটি খুব বড় থাকবে আর উপরের দিকে একটি ছিদ্র করে রাখতে হবে। একটু শুকিয়ে গেলে পরে আগুনে পুড়িয়ে একে শক্ত করে নিতে হবে। বাংলা দেশের সর্বত্র এই খোল বাজী পোড়ানর জন্য ব্যবহার করা হয়।



মাটির তৈরী তুবড়ীর খোল

উনুন : মাটির উনুন দু'রকমের দেখা যায়—স্থায়ী উনুন এবং তোলা-উনুন। স্থায়ী উনুন মাটিতে গর্ত করে ভিতরটা বেশ করে লেপে নিতে হয়। উপরে তিনটি 'ঝিক' বা মাটির উঁচু জায়গা

করে নেবে। এর উপর বসবে হাঁড়ি বা কড়াই। উন্নুন তৈরিতে বাঁশের 'চাছনী' ব্যবহার করা হয়।

তোলা উন্নুন করে বালতির উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে। আগে বালতিটির মাঝামাঝি জায়গায় কয়েকটি ছিদ্র করে ঐ ছিদ্রের ভিতর (এধার-ওধারে) লোহার শলা বা সরু শিক পুরে নিতে হবে। তারপর ঐ বালতির ভিতর-বাহির দুদিকে মাটির প্রলেপ দিয়ে নিতে হবে। অবশ্য বাইরের দিকে প্রলেপ না দিলেও চলে। বালতির গায়ে এবং শিকের ঠিক নীচে ছাই ফেলবার জন্য একটা ছোট চৌকো দরজা করে নিতে হবে।

কুমীর পুতুল ঃ আধ হাত লম্বা একটা সরু মাটির লেচি নাও। ওর ভিতর দিকটা আঙুল দিয়ে টিপে লম্বা গর্ত করে যাও। এটা কুমীরের তলার দিক। এর মাথাটা হবে সরু এবং আর এক প্রান্তে হবে লেজ। অনুরূপ আর একটি লম্বা 'লেচি' ওর উপর বসাও। দেখবে কুমীর তৈরি হ'ল।



মাটির তৈরি বিভিন্ন রকমের ছাঁচ

এবার চাই কিছু কলা-কৌশল। কুমীরটির চোখ ও নাক কর। কতকগুলি ধান নাও। এই ধান হবে কুমীরের গায়ের

কাঁটা। ধানগুলি কুমীরের লেজের উপর তিন সার বসাও। আঙুল দিয়ে পিঠের উপরটা ঠিক কর। এর পেটটি হবে অপেক্ষাকৃত মোটা এবং হাঁ-টা হবে খুব বড়। হাঁ-টির মাঝখানে একটা কাঠি দিয়ে রাখ এবং ধান দিয়ে দু'পাটি দাঁত করে দাও। তারপর কুমীরটি শুকিয়ে রঙ করে নাও।

লেচি চ্যাপ্টা করে নিয়ে একটু শুকিয়ে নরুণ দিয়ে তার উপর ফুল-ফল কেটে ক্ষীরের বা আমসত্ত্বের ছাঁচ করা হয়। ঐ ছাঁচ পরে আগুনে পুড়িয়ে নিতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাতে ও ছাঁচে-তৈরি মাটির জিনিষ

মাটির কাজ সাধারণত তিন রকমে করা হয়—হাতে, ছাঁচে বা ফর্মায় এবং চাকায়। এতক্ষণ হাতে তৈরী সাধারণ পুতুলের



মাটির ছাঁচে-তৈরি জিনিষ

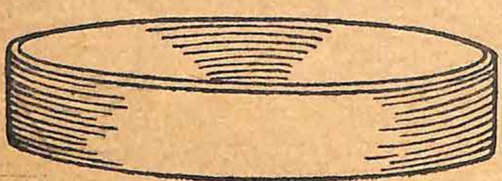
কথা বলা হ'ল। পুতুল ছাঁচেও তৈরি হ'তে পারে। মাটি দিয়ে ছাঁচটা আগে করে নিতে হয়।

যে জিনিষটার ছাঁচ তৈরি হবে তার উপর চট্‌কানো, ভালো এঁটেল মাটির তাল বসিয়ে আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে টিপে দাও। মাটির রসটা একটু টানলে আস্তে আস্তে জিনিষটা থেকে ঐ মাটির ছাঁচ বের করে রৌদ্রে দাও। তারপর ওটাকে পুড়িয়ে নিতে হবে। এটা হবে উল্টো বা নেগেটিভ। এর মধ্যে আবার মাটি দিয়ে আঙুল দিয়ে টিপে নেবে। তারপর ছাঁচটাকে আস্তে আস্তে ঘা দিবে। ঘা দিলে ওর থেকে নতুন তৈরি পুতুলটা বেরিয়ে আসবে। এই পুতুল রৌদ্রে শুকিয়ে (বা পুড়িয়ে) তারপর রঙ করে নিলে দেখতে সুন্দর হয়।

খেলনা পুতুল প্রভৃতি ছাড়াও ছাঁচে বা ফর্মায় আরও অনেক জিনিষ তৈরি হয় ; যেমন, কূয়োর পাট, টালি, খোলা, ইট এই সব।

কূয়োর পাট ঃ পল্লীগ্রামে জলের জন্য কূয়ো খোঁড়া হয়। কূয়োর গর্তে লাগানো হয় মাটির পাট। এইজন্য ঐ কূয়োকে 'পাট-কূয়ো' বা 'পাতকূয়ো' বলা হয়। অল্প খরচে জল পেতে অনেক পল্লীতে এই পাতকূয়োই একমাত্র অবলম্বন। পাতকূয়োর জল শীতকালে গরম ও গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা থাকে।

কূয়োর 'পাট' ফর্মায় করে। এই ফর্মাটা একটা পাটের মতই দেখতে এবং ওটাও মাটি দিয়ে তৈরি। পার্থক্য এই যে, ঐ পাটের ফর্মাটিকে যদি একটা বৃত্ত ধরা যায় তা হ'লে ওর ব্যাস যেখানে পরিধিতে (এধার-ওধার) সংযুক্ত হয়েছে সেখানে দুটি ছিদ্র আছে। এইবার পাট কি করে তৈরি হয়—তা বলছি।



কূয়োর পাট

পাটের ছাঁচ বা ফর্মার কথা আগেই বলেছি। পাট তৈরির মাটিটা ভালো হওয়া চাই। তা না হলে পাট টিকবে না। মাটির সংগে কিছু ধানের তুঁষ মিশিয়ে নেওয়া ভালো। এঁটেল মাটি বেশ করে চট্‌কে নিয়ে ওটা ছায়ায় ভিজে চট বা দরমা দিয়ে ঢেকে রেখে কাজ করা হবে।

একতাল তৈরি মাটি নিয়ে মোটা এবং লম্বা লেচি কর। একটা সমতল জায়গায় লম্বা করে বালি ছিটিয়ে তার উপর এই লেচিটি পেতে ওর পা দিয়ে চেপে দাও। চাপবার সময় একদিকে কানা রেখে যাবে। তারপর একটা ছোট মাটির হাত দুরমুজ দিয়ে ঐ পায়ের চাপের উপর আবার পিটিয়ে যাও।

এইবার ওর থেকে অংশ বিশেষ কেটে কেটে নিয়ে ঐ ফর্মার বাইরের দিকে লাগিয়ে যাও। কানার দিকটা থাকবে উপরে, ঐ ফর্মার কানার উপর দিয়ে।

ফর্মার বাইরের চারধারে ঐ ভাবে ক্রমে ক্রমে মাটি লাগিয়ে নিয়ে জোড়ের জায়গাগুলি বেশ করে টিপে দিতে হবে। তা হলে বেড়টা বেশ সমান দেখাবে।

এইবার ফর্মাটিকে ওর ভিতর থেকে বের করতে হবে। বের করবার আগে কাঁচা মাটির পাটটির মাথা ফর্মা থেকে ফাঁক করে নাও। আর কোন সতর্কতা না নিয়ে এই সময় যদি ফর্মাটিকে ভিতর থেকে তুলে ফেলা হয় তা হলে কাঁচা মাটির নরম পাটটি ভেঙে পড়তেও পারে। এইজন্য দশ-বারোখানা কাঠি কাৎ করে ঐ কাঁচা পাটের কানাও মাটির সংগে ঠেক্‌না দিয়ে নাও। তারপর ফর্মার ছিদ্র দুটির মধ্যে দু'হাতের আঙুল

দিয়ে উপর দিকে তুলে নিয়ে আর একটা সমতল জায়গায় বসাও। এখানে আবার ঐ ভাবে পাট তৈরি হবে।

পাটের ভিতরকার ব্যাসটা একহাত থেকে দু'হাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। কূয়োর ব্যাস অনুসারে পাট ব্যবহৃত হয়। বড় পাটের মধ্যে ছোট পাট বসিয়েও কখনও কখনও ডবল পাটের কূয়ো তৈরি হয়ে থাকে।

কাঁচা 'পাট' রোদ্রে শুকিয়ে তারপর ওগুলি আগুনে পোড়ানো হয়।

টালি ঃ টালি দু'রকমের দেখা যায়,—একরকম হচ্ছে প্লেন ও সাধারণ টালি, আর-এক রকম হচ্ছে রাণীগঞ্জ প্যাটার্ণের টালি। সাধারণ টালি আগে ঘরের মেঝে বা উঠোনে ব্যবহৃত হ'ত। এখন ঐ টালি বড় একটা কেউ ব্যবহার করেন না, কারণ ওটা বেশি দিন টিকে না। সিমেন্ট করে আজকাল লোকে টালির স্থান পূরণ করেন।

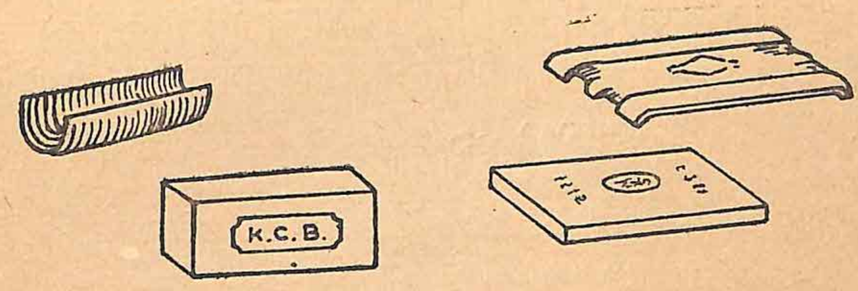
টালির ঘরের জন্য রাণীগঞ্জ প্যাটার্ণের টালি ব্যবহৃত হয়। পাটের মত ফর্মায় ফেলে ওটা তৈরি করে। তবে কূয়োর পাট খাড়াভাবে আর টালির-মাটির সমান্তরাল রেখে করে।

খোলা ঃ খুব গরীব যারা তারা বস্তিতে খোলার ঘরে বাস করে। খোলার ঘর করতে টালির ঘরের চেয়ে খরচ কম; কারণ, টালি খোলার চেয়ে অনেক ভারী। সেইজন্য শক্ত ফ্রেম নীচেয় না থাকলে টালির ঘর হবে না; কিন্তু খোলার ঘরে চালা-ঘরের মত সরু আটন-ছাটন ও বাঁশের রুয়াই চলতে পারে।

মাটির গ্লাস লম্বালম্বি দুখানা করলে যেমন হয়, খোলাগুলিও দেখতে ঠিক সেই রকম। কূয়োর পাট যেভাবে করে মাটির খোলাও

ঠিক সেই পদ্ধতিতে তৈরি হয়। টালি বা খোলা রোদ্রে শুকিয়ে তারপর 'পুয়ানে' পুড়িয়ে নিতে হয়।

ইট : আগেকার দিনে বড় লোকেরাই ইটের ঘরে বাস করতেন। তার কারণ ইটের তখন এত প্রচলন ছিল না এবং বাঁশ, বেত, উলুখড় ও শ্রমিকের মজুরী ছিল কম। সেইজন্য গরীব



মাটির তৈরি—টালি, খোলা ও ইট

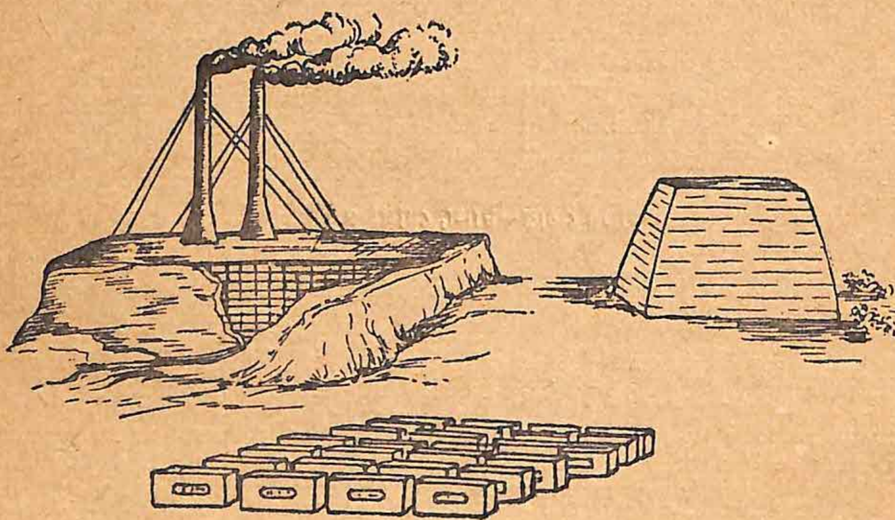
বা মধ্যবিত্তেরা চালাঘরেই বাস করিতেন বেশি ; কিন্তু কালক্রমে এই চালাঘর তৈরির খরচা অত্যন্ত বেশি পড়ায় এবং ইটের ঘর দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় বলে লোকে ইটের ঘরই চেষ্টা করে তৈরি করতো।

একখানা ইট সাধারণত দশ ইঞ্চি লম্বা, পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ও তিন ইঞ্চি পুরু হয়। ইট ফর্মায় কাটা হয়। ফর্মা তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। ফর্মাটি দেখতে কতকটা ডালাহীন বাক্সের মত। তার মধ্যে ঠিক ইটের মাপেই জায়গা থাকে। তলার কাঠটিতে যে ইট কাটে তার সংক্ষিপ্ত নাম বা কোম্পানীর নাম লেখা থাকে। চট্‌কানো, তৈরি মাটি ঐ ফর্মার মধ্য দিয়ে—একটা পাতলা লোহার বা কাঠের পাতের (আঁচড়া) সাহায্যে উপরের দিকটা সমান করে নিতে হয়। ফর্মার দুদিকে ধরবার জায়গা থাকে, সেখানে ধরে

ফর্মাটিকে উল্টিয়ে একটু একটু ঘা দিলেই ইট বেরিয়ে আসে। তারপর উল্টে-পাল্টে এবং পরে সাজিয়ে ইটগুলি শুকিয়ে নিতে হয়।

দো-আঁশ মাটি দিয়ে ইট তৈরি হয়। ভালো ইট অর্থাৎ এক নম্বরের ভালো ইট তৈরি হয় 'পলি'মাটিতে।

ইট সাধারণত দু'রকমে পোড়ানো হয়,—ভাঁটায়, পাঁজায়। চিমনার সাহায্যে এবং কয়লা দিয়ে যেভাবে ইট পোড়ান হয় তাকে বলে ভাঁটা। পাঁজার ইট চতুষ্কোণ আকারে সাজিয়ে ইটের



ইট-পোড়ানো পাঁজা ও ভাঁটা

ভাঁজে ভাঁজে কয়লা দিয়ে পোড়ান হয়। পাঁজার ইট কয়লার বদলে কাঠ দিয়েও পোড়ানো চলে। তখন ইটগুলি অন্যরকমে গোলাকারে সাজানো দরকার। এই পাঁজা ঠিক কুমোরের পোয়ানের মতই তৈরি।

পোড়ানোর পর দেখা যায়, সব ইট সমান পোড়ে না। কোন ইট অত্যন্ত বেশী পুড়েছে, কোন ইট যথাযথ ভাবে পুড়েছে, কোন

ইট ভালোভাবে পোড়েনি এবং কোন ইট অত্যন্ত খারাপ পুড়েছে। এই পোড়া অনুসারে ইটের তারতম্য হয়। যে ইট অত্যন্ত বেশী পোড়ে তাকে বলা হয় 'ঝামা'। ঠিক পুড়লে সেটা হয় এক নম্বর ইট। এর দাম বেশী। কম পোড়া হলে হয়—দু' নম্বর ইট। এর দাম কম। তিন নম্বর ইটের দাম আরও কম।

ইট থেকে তৈরি হয় খোয়া এবং সুরকী।

ইট দিয়ে বাড়ী তৈরি করবার সময় ওর ভিত্ বা প্লিন্থ্ করতে হয় চওড়া, আর ক্রমে উপরের দিকে কম চওড়া করতে হয়। ভিত্ শক্ত হলে উপরে দু-তলা, তিন-তলা করা সহজ। আজকাল সহর অঞ্চলে লোহার ষ্ট্রাকচারের উপরই বাড়ী হচ্ছে।

আগেকার দিনে লোকেরা পাকাবাড়ীর দেওয়াল খুব পুরু করতেন। এখন পনর ইঞ্চি পুরু দেওয়ালই সচরাচর হতে দেখা যায়। সিমেণ্ট দিয়ে আগাগোড়া গেঁথে আজকাল দশ ইঞ্চি-পাঁচ ইঞ্চি এমন কি তিন ইঞ্চি পুরু দেওয়াল করেও ঘর হচ্ছে। বলা বাহুল্য পাঁচ বা তিন ইঞ্চি দেওয়াল করলে তার থাম রাখতে হয় পুরু। ইট একখানার উপর আর একখানা সাজিয়ে গেলেই দেওয়াল হয় না—ওর বাঁধন হচ্ছে বড় কথা। ইটের মধ্যে মিস্ত্রীরা বেশ বাঁধন দিয়ে গাঁথে।

তৃতীয় অধ্যায়

চাকায়-তৈরি মাটির জিনিষ

'চক্র' বা চাকা প্রথম কার মাথা দিয়ে বেরিয়েছিল তা কে জানে? যাঁরই মাথা থেকেই ওটা আবিষ্কৃত হোক্—তিনি যে বড় একজন এঞ্জিনীয়ার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আধুনিক যন্ত্রযুগে কত সেকালের যন্ত্রই ত অচল হয়ে গেল কিন্তু চাকা আজও



কুমোরের চাকায়-তৈরি হাঁড়ি-কলসী

পূর্ণমাত্রায় তার প্রতিষ্ঠা লাভ করে আছে! গরুর গাড়ীতে চাকা অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসচে। কিন্তু আধুনিক যুগেও মোটর গাড়ী, ট্রেন, এরোপ্লেন, থেকে কারখানার বহুবিধ কাজে এই চাকাই বিভিন্ন আকারে ব্যবহৃত হয়ে আসচে।

এখন আমরা কুমোরের চাকার কথা বলছি। এই চাকা কত যুগ-যুগান্তর থেকে যে ব্যবহৃত হয়ে আসচে তার ঠিক নেই। ঢেঁকি, কুলো, লাঙল, গরুর গাড়ী যেমন আমাদের দেশের বহু প্রাচীন জিনিষ, কুমোরের চাকাও তাই!

চাকা ঃ কুমোরের চাকাটা দেখলে মনে হবে, একটা গরুর গাড়ীর চাকাকে বুঝি খাড়া না করে মাটির সংগে সমান্তরালভাবে ঘুরানো হ'চ্ছে! আসলে কিন্তু ওটা গরুর গাড়ীর চাকা নয়।

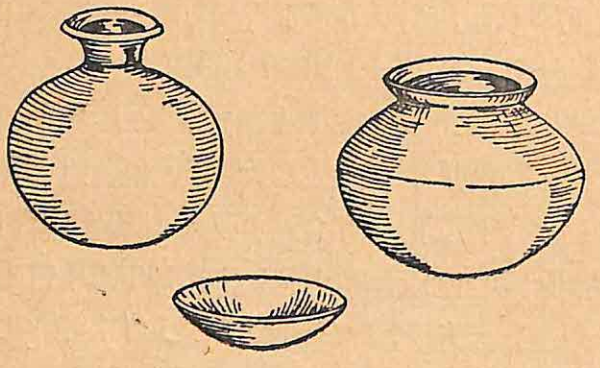
পাঁচখানা বাখারীর সাহায্যে প্রথমে একটা গোলাকার চাকা তৈরি করা হয়। তারপর ঐ বাখারীতে খড় জড়িয়ে তার উপর



কুমোর হাঁড়ি তৈরি করিতেছে

মাটির প্রলেপ দিয়ে নেয়। একখানা কাঠে চারটে খিল (স্পোক) লাগিয়ে ঐ খিলের শেষপ্রান্তগুলি ঐ খড়ের চাকার সংগে জুড়ে দিতে হয়। কাঠের নীচে থাকে একখানা পাথর এবং তাতে থাকে একটা গোল গর্ত। চাকাটির আকার অনুসারে মাটিতে গোলাকার গর্ত করে নিতে হয়। এই গর্তের ঠিক মাঝখানে থাকে

তেঁতুল (বা শিশু) কাঠের একটা ছোট গুঁড়ি। গুঁড়ির মাঝখানে থাকে একটা খিল। খিলের অপর প্রান্ত ঢোকানো থাকে পাথরের



মাটির তৈরি হাঁড়ি, কলসী ও সরা

গোল গর্তের মধ্যে। কারিগর একখানা লাঠি দিয়ে এই চাকার যে কোনও একটা খিলে ধাক্কা দিলে চাকাটি ঘুরতে থাকবে।



মাটির তৈরি পিলসুজ, প্রদীপ, ধুনচি ও ঘট

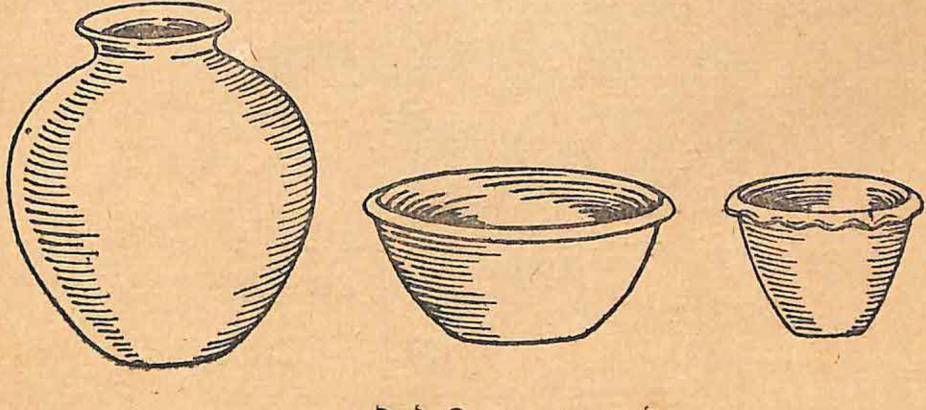
চাকার মাঝখানে তক্তাটির উপর মাটির তাল রাখতে হয়। এই মাটির তাল থেকে কারিগর তার হাতের কৌশলে অনেক কিছু জিনিষ তৈরি করতে পারে।

হাঁড়ি-কলসী : চাকার উপর হাতের কৌশলে হাঁড়ি বা কলসীর উপরার্ধ তৈরি হয়। এই সব জিনিষ তৈরির সময় সুতো,



মাটির তৈরি বাসন

ভিজে ন্যাকড়া ও বাঁশের ছুরি বা চলতি কথায় উঁচু বা চাছনী ব্যবহৃত হয়। মাটি বা কাঠের গোল ফর্মায় মুগুর দিয়ে পিটিয়ে তৈরি হয় নীচের অংশ। কলসীর বা কুঁজোর জল ঠাণ্ডা থাকবে বলে ঐ নীচের অংশে বালি ব্যবহার করা হয়। হাঁড়ি বা কলসীর



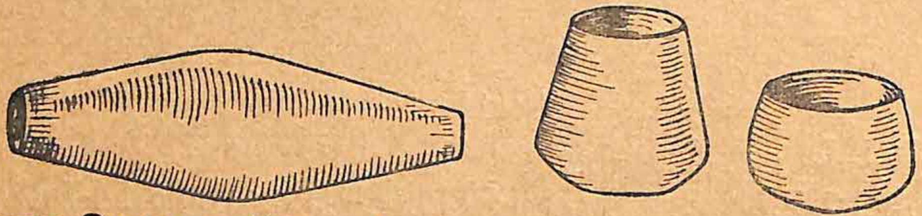
মাটির তৈরি জালা, গামলা ও টব

উপরার্ধ চাকার উপর তৈরি হলে একগাছি শক্ত ও সরু সুতো দিয়ে চাক থেকে ওটা কেটে নামানো হয়। তারপর ওটা রৌদ্রে দেওয়া হয় এবং ভালো করে শুকোবার আগেই তলার অংশ ঐ

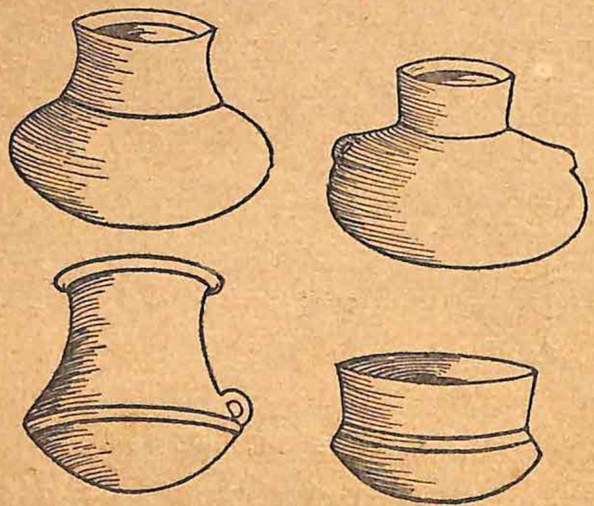
উপরের অংশের সংগে জুড়ে দিতে হয়। বড় বড় জল রাখবার জালাও এই ভাবে তৈরি হয়।

মাটির টব, গেলাস, বদনা, কলকে, পিলসুজ প্রভৃতির সম্পূর্ণটাই তৈরি হয় কুমোরের চাকায়।

কীর্তন গানের সংগে যে 'খোল' বাজানো হয় অথবা বাঁয়া-তবলার 'বাঁয়া' মাটি দিয়েই তৈরি। খোলের অর্ধাংশ আগে তৈরি



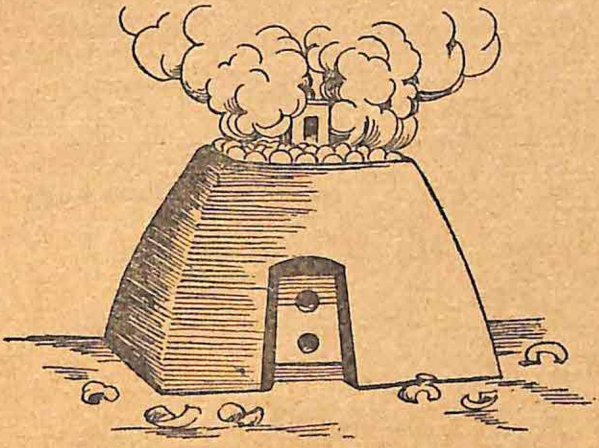
করে নিয়ে সুতো দিয়ে কেটে রোদ্রে দেয়—তারপর আবার অপরাংশ তৈরি করে দুটোর মুখ সুন্দর ভাবে জুড়ে দেয়। এই জোড়া অংশ



হয় খোলের মাঝখানের মোটা জায়গাটা। বাঁয়া জোড়া দিতে হয় না, একেবারেই চাকায় তৈরি করে সুতো দিয়ে কেটে নামানো হয়।

সরা, মালসা, নাদা, ভাঁড়, প্রভৃতি গৃহস্থঘরের নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ। এইভাবে কুমোর তার চাকার সাহায্যে এগুলি তৈরি করে। তৈরি করার পর সেগুলিকে রৌদ্রে শুকিয়ে পরে 'পোয়ানে' পোড়াতে হয়। 'পোয়ান' কুমোরদের বিশেষ চুল্লী। গোলাকার করে এটা তৈরি হয়, এবং নীচেয় ফাঁক থাকে। বাঁশের শুকনো শেকড় প্রভৃতির দ্বারা পোয়ানে হাতে গড়া নানা রকম মাটির জিনিষ পোড়ানো হয়। এইসব জিনিষ এমন ভাবে সাজানো হয় যেন প্রত্যেকটিই ঠিকমত আগুনের উত্তাপ পায়।

অনেক সময় সাজানো জিনিষগুলির উপর তুঁষ ছড়িয়েও দেওয়া হয়। পোয়ান থেকে জিনিষগুলি বের করে তার ছাই প্রভৃতি ঝেড়ে ফেলে সাজানো হয়। সাজাবার সময় বাঁ-হাতের তালুতে জিনিষটি



রেখে ডান-হাতের আঙুল দিয়ে আঘাত করলে জিনিষটি কোথাও ফেটে গিয়েছে কিনা বুঝা যায়। কলসী বা কুঁজোয় জল ঢেলে দেখতে হয় ফুটো আছে কিনা।

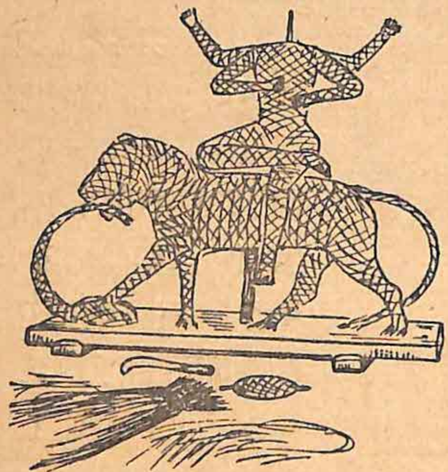
বর্ষাকালটা কুমোরের কাজের পক্ষে বড়ই অসুবিধা। উপযুক্ত ঘর থাকলে যদিও জিনিষপত্র তৈরি সম্ভব, কিন্তু বর্ষার জন্য সেগুলি রৌদ্রে শুকানো বড় মুস্কিল। এইজন্য বর্ষাকালে কুমোরদের গড়ার কাজ প্রায় একরকম বন্ধই থাকে।

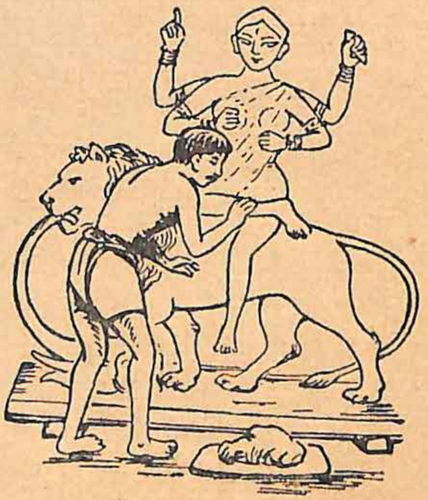
চতুর্থ অধ্যায়

মাটির প্রতিমা গঠন

যাঁরা হাঁড়ি-কলসী গড়েন, তাঁদের বলে কুমোর। আর যাঁরা প্রতিমা গড়েন তাঁদের বলা হয় পাল। যাঁরা প্রতিমায় রঙ দেন, তাঁদের ভাস্করও বলা যেতে পারে।

মাটির প্রতিমা মাটি থেকে তৈরি হলেও সম্পূর্ণ কিন্তু মাটির নয়। বাখারী, দড়ি ও বিচালী দিয়ে আগে তৈরি হয় প্রতিমার 'কাঠামো' বা ফ্রেম। সময় সময় উলু খড়ও ব্যবহার করা হয়।





প্রথমে চাই ঠাকুরের 'পাট'। পাটের উপরেই প্রতিমাটিকে দাঁড় করাতে হয়। 'পাট'—কাঠ বা বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। একখানা দেড় হাত কি দু'হাত (প্রতিমা অনুযায়ী) লম্বা মোটা বাঁশ চিরে সমান দু'খানা করে নিয়ে উপুড় করে মাটিতে রাখ।

এর সংগে তিনটে খিল এঁটে নাও। এইরূপ বাঁশ (বা কাঠ) কে আশ্রয় করে উঠবে প্রতিমার মূর্তি। বিভিন্ন মূর্তির জন্য বিভিন্ন 'কাঠামো' তৈরির প্রয়োজন।

যে মূর্তিই হোক্ না কেন বাখারীর সংগে খড় বা বিচালী বেশ করে দড়ি দিয়ে আগে জড়িয়ে নিতে হবে। সাধারণত প্রতিমার মুখমণ্ডলটি ছাঁচে তুলে নিয়ে ঐ কাঠামোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ঐ খড় বা বিচালীতে দু-তিন বার মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। চলতি কথায় তাকে একমেটে, দো-মেটে, তে-মেটে প্রভৃতি বলা হয়। কাঠামোতে দো-মেটে করার পর সাধারণত মাথাটি বসানো হয়। ছাঁচে প্রতিমার মুখটি তৈরি করে আলাদাভাবে শুকিয়ে নেওয়া দরকার।

মাটির সংগে তুঁষ বা পাটের কুচি মিশিয়ে 'একমেটে' করে। 'দো-মেটে' করবার সময় মূর্তির গলা, কনুই, হাঁটু বা হাতের আঙুল প্রভৃতিতে ন্যাকড়া জড়িয়ে দিলে ঐ সব জায়গা ফাটবে না বা হঠাৎ ভাঙবে না। যে ভাবে চিকিৎসকেরা রোগীকে ন্যাকড়ায় 'প্যারিস প্লাসটার' মাখিয়ে ব্যাণ্ডিস করে, ঠিক সেই ভাবে ন্যাকড়ায় কাদা মাখিয়ে প্রতিমার ঐ সব জায়গায় জড়িয়ে দিতে হয়। একমেটের পর একটু শুকালে দো-মেটে এবং তারপর তে-মেটে করে। যেখানে ফাটল ধরে সেখানেই মাটির প্রলেপ দেওয়া দরকার।

মূর্তিটি ভাল ভাবে শুকালে সমস্তটা খড়ির রঙ দিয়ে নেয়। তারপর দেওয়া হয় অন্যান্য রঙ।

যদি অল্প সময়ের মধ্যে বা বর্ষার মধ্যে প্রতিমা তাড়াতাড়ি শেষ করবার প্রয়োজন হয়, তা হলে আগুনের তাপের সাহায্যে প্রতিমা অল্প সময়েও শুকিয়ে নেওয়া যায়।

চন্দননগর বা কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী ঠাকুর, নবদ্বীপের রাসের ঠাকুর খুব বড় হয়। অনেক সময় অতিকায় প্রতিমা বয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত হয় বলে শোলা দিয়েও ঐ সব ঠাকুর তৈরি হয়ে থাকে।

কৃষ্ণনগরের তৈরি প্রতিমা দেশ-বিখ্যাত। এখানকার খুব নাম-করা একজন শিল্পীর মুখে আমি শুনেছি, প্রতিমাখানি দেখলেই দর্শকের মনে ভক্তিভাব আসবে এমন করতে হ'লে শিল্পীর সাধনা চাই। এই শিল্পী বলেছেন, প্রতিমা-তৈরির এক সপ্তাহকাল তিনি নিরামিষ খেতেন।

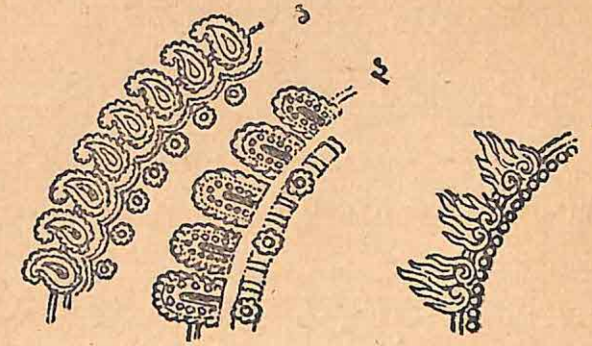
রাত্রে শুয়ে মায়ের মুখ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর একটা রূপ দেখা দিত চোখের সামনে। তিনি অমনি উঠে তিন-চার দিনের পরিশ্রম ক'রে তৈরি যে মুখ তা ভেঙে ফেলতেন। তার জায়গায় তৈরি হ'ত তন্ময় হয়ে চিন্তার ফলে পাওয়া অপরূপ মাতৃ-মূর্তি।

শিল্পীর বয়স হ'য়েছিল অনেক। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এখন আপনি তেমন মূর্তি তৈরি করেন না?

'মনটাকে আগের মত আর গুছিয়ে আনতে পারিনে এক জায়গায়' উত্তর দেন শিল্পী। 'আর তা ছাড়া এখন কেউ চায়ও না তা।' ভক্তি নেই মানুষের মনে। এখন কেবল তমোগুণ—হৈ-হল্লা, চড়বড়ি আর পাড়ায় পাড়ায় প্রতিযোগিতা। এত অহংকারের মধ্যে সে দৃষ্টি আসবে কোথা থেকে? এখন লোকে 'অর্ডার' দেয়—মায়ের এই রকম 'প্যাটার্ণ' হবে, এই রকম 'পোজ' হবে—এই সব! আরে মূর্খ, মায়ের রূপ কি অর্ডার দিয়ে হয়? মায়ের রূপ আসবে শিল্পীর মন থেকে। আসল শিল্পী কথনও পরের 'ফরমাজ' মত কাজ করেন না।'

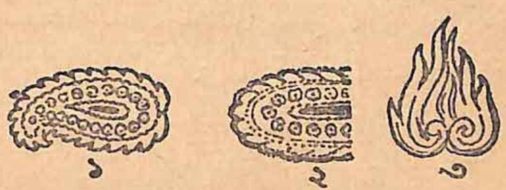
ক্ষোভ ও দুঃখ ফুটে উঠল শিল্পীর মুখে।

প্রতিমার সংগে ঠাকুরের 'ছটা', 'চালচিত্র', 'আঁচলা' প্রভৃতি তৈরিতেও শিল্প-নৈপুণ্য প্রয়োজন। প্রতিমার 'সাজ', 'ডাকের সাজ,



শোলার সাজ, মাটির সাজ' প্রভৃতি বিভিন্ন সাজ ব্যবহৃত হয়। এগুলি মাটির কাজের অন্তর্গত নয় বলে এখানে তার বিশেষ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

চালচিত্র তৈরির আগে কাপড়ের উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে ওটা শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর পেন্সিল দিয়ে ছবি এঁকে



নিয়ে তবে রঙ করতে হয়। 'মাটির সাজ', 'ছাঁছে কাণপাশা' বা অন্যান্য গহনাপত্র তৈরি ক'রে প্রতিমায় লাগিয়ে দেওয়া হয়। সরু তারের সংগে তৈরি হয় মুকুট।

সিংহের কেশর বা মায়ের চুল তৈরি হয় শণ বা পাট দিয়ে। টার্কিশ তোয়ালে জড়িয়ে অনেক সময় সিংহের দেহটাকে তৈরি ক'রে দেওয়া চলে।

পঞ্চম অধ্যায়

মৃৎ-শিল্পে নৈপুণ্য

এতক্ষণ পর্যন্ত মাটির কাজ সম্বন্ধে যা বলা হ'ল, তা অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস থাকলেই করা যেতে পারে; মাটির কাজে 'শিল্প-নৈপুণ্য' দেখাতে হ'লে শিল্পীর প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই।

মানুষ, পশু-পক্ষী, ফল-ফুল, ফুলদানী প্রভৃতি তৈরির মধ্যে শিল্পীর সুক্ষ্মদৃষ্টি ও শিল্প-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্প বিখ্যাত। কেবল দেশের মধ্যেই নয় —বিদেশে এমন কি সুদূর আমেরিকা, লণ্ডন ও জার্মানীতেও এদের খ্যাতি আছে।

লক্ষ্ণৌ এবং এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানেও মাটির নানা রকমের জিনিষ—যেমন ফুলদানী প্রভৃতি তৈরি হয়। কিন্তু সেগুলির সংগে কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পের পার্থক্য এই যে, সেগুলি একই রঙয়ে এবং



একই ছাঁচে তৈরি। তাতে শিল্পীর নিজের নৈপুণ্য প্রকাশ করবার সুযোগ নেই। কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পীদের তৈরি জিনিষে স্বভাবকে অনুকরণ করা হয়। যে জিনিষের যে রঙ, এঁরা সেই জিনিষে সেই

রঙ ফুটাতে বিশেষ পারদর্শী। কেবল তাই নয়। জীবদেহের অংগভংগী প্রকাশেও এঁরা অদ্বিতীয়। একজন বিদেশী কৃষ্ণনগরের তৈরি একটি 'মুচির' মৃৎ-মূর্তি দেখে বলেছিলেন: এঁরা কি এ্যানাটমী-ফিজিওলজি প'ড়ে নেন নাকি আগে?

জীবদেহের শিরা, পেশী প্রভৃতির প্রকাশ এঁরা এমন নিখুঁত-ভাবে করতে পারেন যে, দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। জীবের কি রকম মন-বৃত্তিতে শিরা বা পেশীর কোন্ কোন্ জায়গা স্ফীত হয়, কি কাজে কোন্ পেশীর সংকোচন বা প্রসারণ হয়, তা এঁরা বিশেষ ক'রে জানেন।

মাছ: মাছ ছাঁচেও তৈরি হয়—আবার হাতেও করা যায়। ফরিদপুর অঞ্চলে ছাঁচে এক রকম ইলিশ মাছ তৈরি হয়। তাতে শিল্প-নৈপুণ্য কিছুমাত্র নেই। কৃষ্ণনগরেও ছাঁচে কাতলা মাছ প্রভৃতি তৈরি হয় কিন্তু তাতে রঙ ফলানোর বাহাদুরী আছে। কাতলা মাছের যেখানে যে রকম রঙ কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা ঠিক সেই রঙ দিয়ে মাছটিকে একেবারে বাস্তবের মত তৈরি করেন।

কিন্তু এর চাইতেও কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা তাঁদের গলদা চিংড়ি তৈরিতে শিল্প-কৌশল বেশি দেখান। লোহার সরু তার দিয়ে চিংড়ির ঠ্যাং প্রভৃতি তৈরি হয়। এতে তাঁদের সুক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। চিংড়ির যেখানে রঙ ফিকে অথবা যেখানে যেখানে গাঢ় নীল রঙ এঁরা ঠিক সেখানে সেখানে সেই রঙই ব্যবহার করেন।

কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পীদের শিল্পকলা সম্বন্ধে অনেক কাহিনীও আছে। সেগুলি গল্পের মতই শোনাবে। ঘটনাগুলি কিন্তু সত্য!

নবদ্বীপ বাস যাবে। গাড়ী ষ্টার্ট দিয়েছে। কনডাক্‌টার হাঁকছে—নবদ্বীপ, নবদ্বীপ। এমন সময় ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে উঠলেন ঘূর্ণীর (কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত, এখানেই মৃৎ-শিল্পীদের বাস) একজন ভদ্রলোক,—তাঁর হাতে আধ ডজন গলদা চিংড়ি।

কোর্টের কাজ সেরে এই বাসেই ফিরছিলেন নবদ্বীপের জনৈক গোস্বামী। পাশে তাঁর টিনের সুটকেশ, হাতে জপের মালা।

লোকটি তাঁর হাতের চিংড়ি মাছগুলি সেই সুটকেশের উপর রেখে পাশে বসতেই গোঁসাইজী দাঁড়িয়ে প'ড়ে বাঁ-হাত দিয়ে লোকটির মাথায় মারলেন প্রকাণ্ড রকমের একটা চাঁটি! বেয়াদপ অর্বাচীন, মাছ রাখবার আর জায়গা পেলে না!

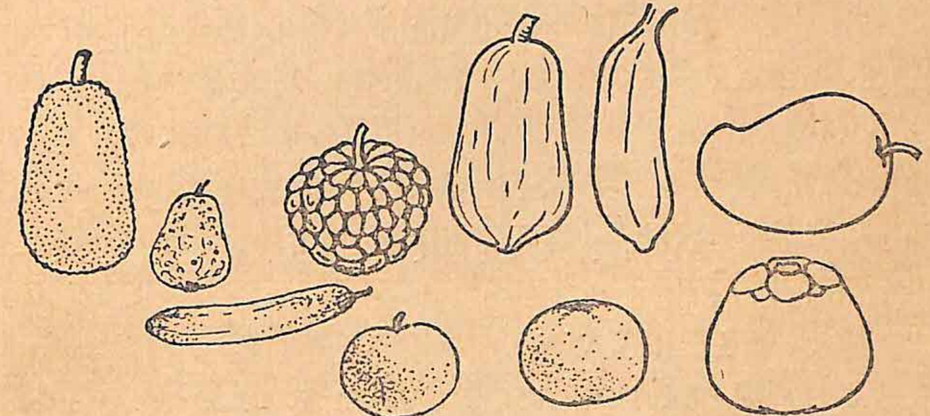
লোকটি কিন্তু মার খেয়ে আহ্লাদে আটখানা! সে বার বার বৈষ্ণবের পদধূলি নিয়ে বলে: আশীর্বাদ কর গোঁসাই, এই রকম ভুল যেন আর পাঁচজনেও করে।

অ্যাঃ—তবে কি ওগুলি সত্যিই মাছ নয়! বৈষ্ণবের রাগ জল হয়ে গেল।

লোকটি আর কেউ নয়—মাছ নিয়ে যাচ্ছিলেন একজন মৃৎ-শিল্পী ত্রিপুরার রাজাকে দিতে।

ফল: কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পীরা নানারকম ফলও তৈরি করেন। ডাব, তরমুজের ফালি, এঁচড়, পেয়ারা, আতা, লংকা, কলার ছড়া, ডালিম, বেদানা, সুপারী, লবঙ্গ, এলাচ, বেগুন, তেঁতুল এই সব। প্রত্যেকটি ফলই ছাঁচে তৈরি করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর ওগুলি পুড়িয়ে রঙ করা হয়। ফলগুলিকে এমন সুন্দর করে রঙ করা হয় যে সেগুলিকে বাস্তব ফল বলেই মনে হবে।

একবার কোনও প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পীরা তাঁদের তৈরি ফল নিয়ে গিয়েছিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন প্রদর্শনীর সভাপতি। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের কাছে গিয়ে তিনি দেখলেন, মাটি দিয়ে তৈরি একটা পাঁঠার ছিন্ন মাথায় যে রক্তের দাগ রয়েছে



তার উপর বার বার মাছি উড়ে এসে বসছে! অনেকে তা দেখে অবাক হ'ল; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শিক্ষিত লোক—তিনি অত সহজেই মুগ্ধ হ'তে পারেন না। তিনি ব'ললেন, মশা-মাছি, কীট-পতংগ প্রভৃতিকে ভুলানো যত সহজ, মানুষকে ভুলানো তত সহজ নয়। তারপর তিনি তাঁর সংগীদের ব'ললেন, ইটালী দেশের দুই চিত্রকরের সেই গল্প। একজনের তৈরি ফুলে মৌমাছি গিয়ে উড়ে বসছে কিন্তু আর একজনের তৈরি জিনিষ দেখতে গিয়ে বিচারক যখন পর্দা সরাতে যাবেন, দেখেন ওটা আসলে পর্দাই নয় অংকিত চিত্র মাত্র। দ্বিতীয় শিল্পীই পেয়েছিলেন প্রথম পুরস্কার।

তিনি কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পের প্রশংসা করলেন, কিন্তু সেগুলিকে যে আসল জিনিষ বলে মনে হবে তা তিনি স্বীকার করলেন না।

পরদিন বিকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোর কাছ দিয়ে একজন ফল-বিক্রেতা হেঁকে যাচ্ছে—চাই পেঁপে, পাকা পেঁপে চাই, ভালো পাকা পেঁপে।

সাহেব বারান্দায় পাইপ টানছিলেন। আর্দালীকে দিয়ে ফলওয়ালাকে ডাকালেন। ফলওয়ালা ভিতরে ঢুকে তার ঝাঁকা নামিয়ে সাহেবকে নমস্কার করে দাঁড়ালো। সাহেব বললেন, কি দাম তোমার পেঁপের ?

বিক্রেতা মাথা নীচু করে বলল ঃ হুজুরের কাছে দামের কথা আর কি বলব,—কোন্ কোন্‌টা পছন্দ হয় হুজুর বলুন—আমি নামিয়ে দিই।

এখন খাওয়া যাবে ত ?

ঃ আমার ফলে পাক ধরেছে দেখুন, হুজুর—তবে খাওয়ার কথা—সে আমি বলতে পারবো না।

ঃ গাছের পাতা চাপা দিয়ে পাকাও নিত ?

ফলওয়ালা দাঁতে জিব কেটে হাত যোড় করে বলে ঃ এ আমার কেনা ফল নয় হুজুর—নিজের হাতে তৈরি ফল—গাছের পাতা দিয়ে রঙ চড়িয়ে সেই ফল আনব হুজুরের কাছে।

সাহেব ভালো দেখে ঝাঁকার ভিতর থেকে তিন-চারটে ফল দেখিয়ে দেন। ফলওয়ালা নামিয়ে দেয় মাটিতে। কিন্তু একি! আর্দালী ফলগুলি হাতে নিয়েই অবাক্!—এত হাল্কা কেন ?

সাহেব বলেন দেখি! তিনিও হাতে নেন ফল। তারপর অকস্মাৎ গম্ভীর হ'য়ে যান। কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পী হাত যোড় করে বলে ঃ অপরাধ নেবেন না হুজুর। কাল আপনি সেই কথা

বলেছিলেন বলেই পরীক্ষা করে নিলাম, আমাদের হাত ঠিক আছে কিনা।

সাহেব খুশী হ'য়ে শিল্পীকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন।

এখানকার শিল্পীরা মাকড়সা, আরশুলা, টিকটিকি প্রভৃতি এত সুন্দর তৈরি করেন যে আগে থেকে জানা না থাকলে ওগুলি যে সত্যিকারের না হয়ে মাটির তা বোঝাই যায় না।

প্রতিমূর্ত্তি : প্রতিমূর্তি তৈরিতেও কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা বিশেষ পারদর্শী। কলিকাতা যাদুঘরের অনেক প্রতিমূর্তিই কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পীর তৈরি।

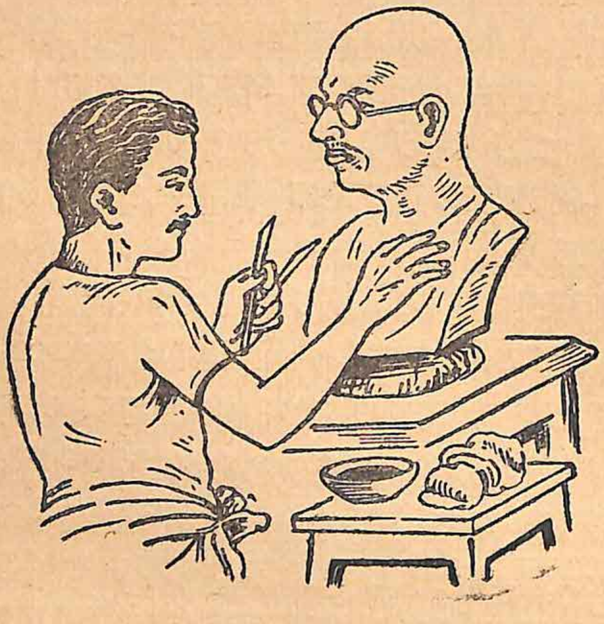
কলিকাতার কুমারটুলীতে যে সব মৃৎ-শিল্পী আছেন, খোঁজ নিলে দেখা যাবে তাঁদের অনেকেরই আদি বাস কৃষ্ণনগরে।

প্রতিমূর্তি সাধারণত দু' রকমে করা হয়—আবক্ষ বড় মূর্তি এবং ছোট সম্পূর্ণ মূর্তি। কখনও কখনও বাস্তব আকারে সম্পূর্ণ প্রতিমূর্তিটিও করা হয়।

সম্পূর্ণ ছোট মূর্তিগুলি আবার দু' রকমে করা হয়। ছাঁচে ও হাতে। ছাঁচের মূর্তিগুলি পোড়ানো হয় কিন্তু হাতে তৈরি মূর্তি পোড়ানো হয় না। ছাঁচে তৈরি মূর্তির—যেমন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী কি বুদ্ধের মূর্তিগুলি বেশী বিক্রী হয় বলে এগুলো কোনও মূর্তি থেকে ওরা ছাঁচ তৈরি করে নেন। তারপর সেই ছাঁচ থেকে একই ধরণের বহু মূর্তি পাওয়া যায়। এইগুলির দাম অপেক্ষাকৃত কম।

কিন্তু হাতে তৈরি যে সব শিল্পকাজ—যেমন, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান। রাস্তার কাদায় তার গাড়ীর চাকা গেছে আটকে—

গরুগুলি জোরে টানছে কিন্তু চাকা উঠছে না, জেলে জাল নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছে, পুরুত ঠাকুর সাজি নিয়ে ফুল তুলতে যাচ্ছেন, মুচি তার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ কচ্ছে—এই সব তৈরি করতে ধৈর্য, সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রভৃতির প্রয়োজন। লোহার সরু তারের সংগে মাটি



লাগিয়ে এই সব আকৃতির হাত-পা প্রভৃতি করা হয়। ক্ষুদ্র অবয়বের মধ্যে শিল্পীকে ফুটিয়ে তুলতে হবে প্রতিকৃতিটির চরিত্র। বাংলার ঘর বাড়ী, বাঙালীর সমাজচিত্র পাওয়া যাবে এই সব শিল্পীর কাছে।

এক সময়ে কৃষ্ণনগরের কোনও প্রসিদ্ধ মৃৎ-শিল্পী তৈরি করেছিলেন তাঁর গুরুদেবের প্রতিমূর্তি। মূর্তিটি একখানা চৌকির উপর বসানো ছিল।

তাঁর আর একজন শিষ্য কিছুদিন পরে গুরুদেবের সংগে দেখা করতে আশ্রমে এলেন। গুরুদেবকে আসনে উপবিষ্ট দেখে তিনি তাঁকে সাষ্টাংগে প্রণিপাত করলেন। তারপর তাঁর পায়ের কাছে বসে থাকলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অবশেষে উঠে গিয়ে এক গুরু-ভাইকে বললেনঃ হাঁ ভাই, গুরুদেবের কাছে এতক্ষণ বসে থাকলাম—তিনি আমার সংগে একটা কথাও বললেন না !—আমি কি অপরাধ করলাম ?

গুরুভাই বললেন, সেকি ! গুরুদেব ত দেওঘর গিয়েছেন, আজ সাত দিন হ'ল !

ঐ যে ওখানে ব'সে আছেন তবে কে ? গুরুভাই বুঝলেন, মাটির মূর্তিকেই শিষ্য আসল মানুষ বলে মনে করেছেন !

কেবল বংলার নিজস্ব জিনিষই নয়—কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পীরা ইটালীয় শিল্পীদের অনুকরণে এ্যাপোলো, জুপিটর এবং কুমারী মেরী, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতির মৃৎ-মূর্তিও তৈরি করে থাকেন। জীবিত কোনও ব্যক্তিকে সম্মুখে রেখে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এখানকার শিল্পীরা তাঁর প্রতিমূর্তি তৈরি করে থাকেন।

হাতের কৌশল, গভীর দৃষ্টিভংগী, পেশী ও শিরা সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং সর্বোপরি রঙয়ের উপর অদ্ভুত দক্ষতাই এঁদের কৃতিত্বের প্রধান কারণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৃৎ-শিল্পের অন্য উপাদান

মাটি দিয়ে কোন জিনিষ তৈরি করলে তা যত সুশ্রীই হোক্ না কেন, তার সব চাইতে বড় অসুবিধা—ওটা বেশী দিন স্থায়ী হয় না।

মাটির কাজের এই অসুবিধা দূর করবার জন্য শিল্পীরা মূর্তি নির্মাণে 'প্যারিস প্লাষ্টার' এবং অন্যান্য কাজে 'কেওলিন' (চীনা মাটি, প্রভৃতি ব্যবহার করেন। 'কোয়ার্ন্স' ও 'পোর্সেলিনের' জিনিষ তৈরি করতে সাদা চীনে মাটির সংগে নানা রকম পাথরের গুঁড়ো ব্যবহৃত হয়। এই গুঁড়োগুলি খুব সুক্ষ্ম ভাবে চূর্ণ করে না নিলে মাটির সংগে ভালো ক'রে মিশতে পারে না।

কেওলিন (বা চিনা মাটি) ঃ চীনা মাটি তৈরি হয় সিলিকা, অ্যালুমিনা, লোহ-অক্সাইড, চুন, ম্যাগনেসিয়া, অ্যালকালির সংমিশ্রণে। এই বস্তুগুলির কম-বেশী কেওলিনের ভালো মন্দ নির্ভর করে। খাঁটি কেওলিনের রঙ সাদা কিন্তু খাঁটি না হলে এর রঙ ধূসর হয়। পরিষ্কার করে ধোয়ার পর যে কেওলিন পাওয়া যায় তা মাটির মতই নরম।

ভারতের বোম্বাই ও বিহার প্রদেশে, বাঙ্গালোর, ত্রিবাংকুর, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে কেওলিন পাওয়া যায়। মহীশূর, ত্রিবাংকুরে সাদা মৃৎপাত্র তৈরি হয়। বাঙলার বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জায়গায় যে মাটি পাওয়া যায় তা পোর্সেলিন তৈরির উপযোগী নয়।

মৃৎ-শিল্পের প্রথম কথা মাটি তৈরি। মাটিতে বালি-কাঁকর থাকবে না। মাটির কণা যত সুক্ষ্ম হবে তত ভালো কাজ হবে তাতে! মাটির হাঁড়ি-কলসী ফুটো হওয়ার প্রধান কারণ, মাটির মধ্যে কাঁকর ছোট শামুক প্রভৃতি থাকে। আগুনে পোড়াবার সময় ঐগুলি পুড়ে চুণের মত হ'য়ে যায়—ফলে, ওখান দিয়ে জল পড়ে।

কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পীদের রঙ ফলানো একটি অদ্ভূত ক্ষমতা। এটা অবশ্য শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভংগীর উপর নির্ভর করে। প্রকৃতির ফল, ফুল বা জীবন্ত জীব-জন্তুর দেহের কোথায় কি রকম বর্ণ সমাবেশ মনোযোগ দিয়ে শিল্পীর তা দেখা দরকার।

রঙকে পাকা করবার জন্য রঙের মধ্যে তেঁতুলবীজের আঠা মিশিয়ে নেওয়া হয়। তেঁতুল্ বীজগুলি খোলায় ভেজে নিয়ে ঢেঁকিতে ওর উপরের শক্ত আবরণ তুলে ফেলা দরকার। তারপর ঐ সাদা শাঁসগুলি বেশ করে গুঁড়ো করে নিয়ে জলের সংগে জাল দিয়ে নিলে আঠার মত হয়। ঐ জিনিষ রঙের সংগে মিশিয়ে দিলে রঙটি বেশ পাকা হবে।



ডিম ও আহার্য গ্রহণ করার পাত্র



মাটির ঘোড়-সওয়ার সাতশো বছর আগের

রথের পুতুল মাটির ঘোড়া-বাঁশি আজকের দিনের

[দক্ষিণ ইরাণের ওয়াজিত নামক জায়গায় কিছুকাল আগে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে—একটা পুতুলের দোকান। এই বিষয়ের পণ্ডিতেরা বলেন পুতুলগুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ প্রায় সাতশো বছর আগে তৈরি হয়েছিল।]



মাটির পুতুল



মাটির তৈরি পাখী, পাখীর বাসা